Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবীদের দাওয়াত কেমন ছিল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুরাইয়া

রোলঃ 23090120248

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবীদের দাওয়াত কেমন ছিল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুরাইয়া
রোলঃ 23090120248

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সাহাবীদের দাওয়াত কেমন ছিল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুরাইয়া, আইডিঃ 23090120248 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সাহাবীদের দাওয়াত কেমন ছিল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

সুরাইয়া

আইডিঃ 23090120248

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: দাওয়াতের মূল ভিত্তি 1

১.১. দাওয়াত: উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ 1

১.২. সাহাবীদের দাওয়াতের মূল লক্ষ্য 1

১.৩.ইলম(জ্ঞান) ও আমল(কর্ম)- দাওয়াতের প্রধান শর্ত 2

১.৪. ইখলাস (আন্তরিকতা) - দাওয়াতের প্রাণশক্তি 2

দ্বিতীয় অধ্যায়: দাওয়াতের নববী পদ্ধতি ও সাহাবীদের অনুসরণ 4

২.১. বিনয় ও নম্রতা: ফেরাউনের কাছে দাওয়াতের শিক্ষা 4

২.২. হিকমত (প্রজ্ঞা) ও মও‘ইজাতুল হাসানাহ (উত্তম উপদেশ): 6

২.৩. দাওয়াতের সূচনা: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর আহ্বান 7

২.৪. ব্যক্তিগত দাওয়াত: প্রথম যুগের অগ্রপথিকগণ 8

২.৫. আমলী দাওয়াত: চরিত্র ও আচরণের মাধ্যমে আহ্বান নিয়ে নিচে আলোচনা শুরু করছি। 9

তৃতীয় অধ্যায়:সাহাবীদের দাওয়াতের কৌশল ও কর্মপদ্ধতি 11

৩.১. ধৈর্য ও সহনশীলতা: মক্কী জীবনের কঠিন পরীক্ষা 11

৩.২. মানুষকে ভালোবাসার মাধ্যমে দাওয়াত 12

৩.৩. সম্পর্ক তৈরি ও প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে দাওয়াত 13

৩.৪. সামাজিক সংস্কারে সাহাবীদের ভূমিকা 14

৩.৫. কঠিন পরিস্থিতিতে সাহসিকতার সাথে দাওয়াত 15

চতুর্থ অধ্যায়: হযরত আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালার দাওয়াত 17

৪.১. ব্যক্তিগত প্রভাব : 17

৪.২. হযরত মুস‘আব ইবনে উমায়ের (রা.) 18

৪.৩. হযরত উমর (রা.)-এর দাওয়াত: 19

৪.৪. দাওয়াতের জন্য সাহাবীদের দূর-দূরান্তে হিজরত ও কুরবানি 20

৪.৫. নারী সাহাবীদের দাওয়াতী ভূমিকা 22
৫ম অধ্যায়:আধুনিক প্রেক্ষাপটে সাহাবীদের দাওয়াতী আদর্শ 24
৫.১. উন্নত চরিত্র ও আমলের মাধ্যমে দাওয়াত (দাওয়াত বিল-হাল): 24
৫.২. যুগোপযোগী মাধ্যম ও কৌশল ব্যবহার: 25
৫.৩. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দাওয়াত ও পর্যায়ক্রমিকতা: 25
৫.৪. পারিবারিক ও ব্যক্তিগত পরিসরে দাওয়াত: 26
ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার 27
৬.১. দাওয়াতের সুফল ও ব্যর্থতার কারণ : 27
৬.২. আমাদের প্রতি দাওয়াতী দায়িত্ব 28
সপ্তম অধ্যায়: তথ্যসূত্র 30

প্রথম অধ্যায়: দাওয়াতের মূল ভিত্তি

১.১. দাওয়াত: উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এই উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে ঘোষণা করেছেন: "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ করো এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখো।" (আল-ইমরান ৩:১১০)। এই আয়াতের গভীর বিশ্লেষণে দেখা যায়, আমাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব নিছক জন্মগত বা পরিচয়ের ভিত্তিতে নয়, বরং এর প্রধান কারণ হলো দাওয়াতের দায়িত্ব।

সাহাবীদের জীবন ও কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা অনুযায়ী, তিনটি মৌলিক কাজের ওপর এই উম্মতের মর্যাদা নির্ভরশীল: সৎকাজের আদেশ (আমর বিল মা'রূফ), অসৎকাজের নিষেধ (নাহী আনিল মুনকার), এবং আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান (তুকমিনূনা বিল্লাহ)। এই তিনটি কাজের সমন্বিত রূপই হলো 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' (আল্লাহর পথে আহ্বান)।

যখন কোনো উম্মত নিজ দায়িত্ব ভুলে গিয়ে শুধু নিজেদের আমল নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তখন তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিলীন হতে থাকে। পক্ষান্তরে, যখন এই উম্মত নবীজির (সা.) আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, ব্যক্তিগত জীবন পরিশুদ্ধ রেখে, নম্রতা, প্রজ্ঞা ও সর্বোত্তম চরিত্রের মাধ্যমে মানবজাতিকে সত্যের পথে আহ্বান করে, তখনই তারা তাদের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয় এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। দাওয়াত হলো এই উম্মতের টিকে থাকার এবং বিশ্ব পরিচালনায় নেতৃত্ব দানের মূলমন্ত্র।

১.২. সাহাবীদের দাওয়াতের মূল লক্ষ্য

সাহাবীদের (রাঃ) দাওয়াতের মূল লক্ষ্য ছিল বেশ কয়েকটি বিষয়ের সমন্বয়, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিশনেরই ধারাবাহিকতা ছিল:

১. তাওহীদ প্রতিষ্ঠা:

* মানুষকে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব ও ইবাদতের দিকে আহবান করা।

* আল্লাহর একত্ববাদ (তাওহীদ) এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করানো।

* মানুষকে সৃষ্টিজীবের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্যে নিবেদিত করা।

২. ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি:

* মানুষকে দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে আখেরাতের প্রশস্ততায় উন্নীত করা।

* ইসলামী জীবনবিধানের দিকে আহবান করে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পথ দেখানো।

* জাহান্নামের শাস্তি থেকে মানুষকে রক্ষা করে জান্নাতের পথে পরিচালিত করা।

৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও প্রচার:

* আল্লাহর দ্বীন (ইসলাম) প্রচার ও প্রসার করা এবং জমিনে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করা।
* সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা।
* নবী-রাসূলদের (আঃ) রেখে যাওয়া দ্বীনের দায়িত্ব পালন করা।

৪. মানুষের সংশোধন:

* নিজে সংশোধিত হওয়া এবং অন্যদেরকেও সংশোধন হওয়ার জন্য আহবান জানানো।
* বাতিলপন্থী ও ফাসিকদের হাত থেকে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়ে সৎপথ অবলম্বনকারীদের হাতে তুলে দেওয়া।

সংক্ষেপে বলা যায়, সাহাবীদের দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে তাওহীদের দিকে আহবান, ইসলামের ইনসাফের সুশীতল ছায়ায় নিয়ে আসা এবং তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ নিশ্চিত করা।

১.৩.ইলম(জ্ঞান) ও আমল(কর্ম)- দাওয়াতের প্রধান শর্ত

সাহাবীদের দাওয়াতের সাফল্যের জন্য ইলম এবং আমল ছিল অপরিহার্য।

ক. ইলম (জ্ঞান): দাওয়াতের ভিত্তি

দাওয়াতকারীর অবশ্যই তাওহীদ, হালাল-হারাম, ও ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান (বাছীরাহ) থাকতে হবে। জ্ঞান ছাড়া দাওয়াতকারী নিজেই বিভ্রান্ত হতে পারে এবং অন্যদেরও ভুল পথে চালিত করতে পারে।

খ. আমল (কর্ম): দাওয়াতের সাক্ষী

দাওয়াতকারী যা বলে, তার জীবনে যদি তার প্রতিফলন না থাকে, তবে তার দাওয়াত শক্তিহীন হয়ে যায়। সাহাবীদের চরিত্রই ছিল তাঁদের দাওয়াতের জীবন্ত প্রমাণ।

১.৪. ইখলাস (আন্তরিকতা) - দাওয়াতের প্রাণশক্তি

ইখলাস (আন্তরিকতা) সত্যিই দাওয়াতের প্রাণশক্তি। এটি ছাড়া দাওয়াতের কাজ আল্লাহর কাছে কবুল হয় না এবং এর কোনো মূল্য থাকে না।

* ইখলাসের গুরুত্ব

ইখলাস শব্দের অর্থ হলো একনিষ্ঠতা বা খাঁটি করা। দাওয়াতের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম:

কবুল হওয়ার মূল শর্ত: দাওয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যেকোনো ইবাদত আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্তের মধ্যে প্রধান হলো ইখলাস। অর্থাৎ, দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্য হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালে মুক্তি লাভ।

নিয়তের বিশুদ্ধতা: নবী-রাসূলদের দাওয়াতের মূল চাবিকাঠি ছিল ইখলাস। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "নিশ্চয়ই সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।" (বুখারী ও মুসলিম)

ফলাফল নির্ভর করে: ইখলাস না থাকলে লোক দেখানো বা দুনিয়াবী কোনো লাভের উদ্দেশ্যে করা লম্বা ওয়াজ বা দাওয়াতী কাজও নিরর্থক হয়ে যায়।

উত্তম কথার মানদণ্ড: আল্লাহ তাআলা বলেন, "যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার থাকতে পারে?" (সূরা হা-মীম সাজদাহ: ৩৩)। এই উত্তমতত্ত্ব অর্জনের জন্য ইখলাস অপরিহার্য।

* ইখলাস ছাড়া দাওয়াতের পরিণতি

যদি কোনো দাঈ আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে (যেমন, খ্যাতি, নেতৃত্ব, অর্থ বা লোক দেখানো) দাওয়াত দেন, তবে সেই আমলের বিনিময়ে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোনো পুরস্কার তো মেলেই না, বরং পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

সংক্ষেপে বলা যায়, ইখলাস হলো দাওয়াতের রুহ বা আত্মা। এটি ছাড়া দাওয়াতের শরীর প্রাণহীন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: দাওয়াতের নববী পদ্ধতি ও সাহাবীদের অনুসরণ

২.১. বিনয় ও নম্রতা: ফেরাউনের কাছে দাওয়াতের শিক্ষা

সাহাবীদের (রা.) দাওয়াতী পদ্ধতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল নম্রতা (রিফক) এবং কোমলতা (লীন)। ইসলামের দাওয়াত হলো আলোর দিকে আহ্বান, আর এই আলো বিতরণের জন্য চরমপন্থিতা বা কঠোরতা নয়, বরং প্রয়োজন ছিল দরদ ও ভালোবাসার। সাহাবীরা (রা.) এই শিক্ষা সরাসরি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সা.) জীবন থেকে লাভ করেছিলেন।

* নববী আদর্শ: আল্লাহর রহমত

সাহাবীরা (রা.) তাঁদের নেতা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন থেকে এই গুণটি সরাসরি শিখেছিলেন। রাসূল (সা.) তাঁর উম্মত ও এমনকি শত্রুদের প্রতিও এতটা কোমল ছিলেন যে, তা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার কাছে প্রশংসিত হয়েছিল।

আল্লাহ তাআলা রাসূল (সা.)-কে লক্ষ্য করে বলেন: "আর এটা আল্লাহর অনুগ্রহের ফলেই যে, আপনি তাদের জন্য কোমলহৃদয় হয়েছেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠিনচিত্ত হতেন, তবে তারা অবশ্যই আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেত।" (সূরা আলে ইমরান ৩:১৫৯)।

এই আয়াত সাহাবীদের (রা.) জন্য এক স্থায়ী শিক্ষা ছিল যে, দাওয়াতী কাজ হলো আল্লাহর রহমত বিতরণ করা। কঠোরতা বা রূঢ়তা কখনোই রহমতের বাহক হতে পারে না। যখন কোনো দাওয়াতকারী এই নববী আদর্শ অনুসরণ করে, তখন তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ জন্মায়।

* ফেরাউনের কাছে দাওয়াতের শিক্ষা: চরম বিনয়

দাওয়াতী পদ্ধতির ক্ষেত্রে চরম ক্ষমতার অধিকারী এবং অহংকারী ব্যক্তির কাছে কেমন আচরণ করতে হয়, তার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত আল্লাহ নিজেই স্থাপন করেছেন। তিনি যখন হযরত মূসা (আ.) ও হারুন (আ.)-কে পৃথিবীর সবচেয়ে দাম্ভিক ব্যক্তি—যিনি নিজেকে রব বা প্রভু দাবি করতেন—সেই ফেরাউনের কাছে প্রেরণ করলেন, তখন নির্দেশ দিলেন:

"তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও, সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে। তোমরা তার সঙ্গে নরম কথা বলবে; হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।" (সূরা ত্ব-হা ২০:৪৩-৪৪)।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এই আয়াত থেকে গভীর শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন:

* নম্রতা হলো কৌশল: দাওয়াতের উদ্দেশ্য হলো হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো, প্রতিশোধ নেওয়া নয়। নম্র কথা বলার ফলে হয়তো ফেরাউনের মতো লোকও উপদেশ গ্রহণ করতে পারত।
* সকলের প্রতি সমতা: এমনকি ইসলামের ঘোর শত্রুদের প্রতিও দাওয়াতের ক্ষেত্রে কোমলতা ও বিনয় প্রদর্শন করতে হবে। সরলমনা মুসলিমদের প্রতি দাওয়াতকারীর অনুভূতি কেমন হওয়া উচিত, তা এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট।

* দাওয়াতে কোমলতার প্রভাব:

সাহাবীরা (রা.) যখন দাওয়াত দিতেন, তখন তাঁদের বিনয় ও নম্রতা আমন্ত্রিত ব্যক্তির মধ্যে আস্থা ও স্বস্তি সৃষ্টি করত। তাঁরা নিজেদেরকে উপদেশদাতার চেয়ে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু

হিসেবে উপস্থাপন করতেন। এই কারণে তাঁদের দাওয়াত কেবল মস্তিষ্কে নয়, হৃদয়েও প্রবেশ করত এবং সফলতার পথ তৈরি করত।

২.২. হিকমত (প্রজ্ঞা) ও মও'ইজাতুল হাসানাহ (উত্তম উপদেশ):

সাহাবায়ে কেরামের (রা.) দাওয়াতী পদ্ধতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো হিকমত (প্রজ্ঞা) ও মও'ইজাতুল হাসানাহ (উত্তম উপদেশ) অবলম্বন করা। হিকমত হলো সঠিক সময়ে, সঠিক ব্যক্তিকে, সঠিক ভাষায়, সঠিক কথাটি বলার ক্ষমতা। দাওয়াতের ক্ষেত্রে, প্রজ্ঞা হলো ব্যক্তির মানসিকতা, সামাজিক অবস্থান এবং তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝে দাওয়াত পেশ করা।
ক. দাওয়াতের প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতি (হিকমত)
দাওয়াতকে ফলপ্রসূ করতে হলে হিকমতের কোনো বিকল্প নেই। সাহাবীরা (রা.) কখনো সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরি করতেন না, বরং এমনভাবে দ্বীন পেশ করতেন যাতে মানুষ সহজে তা গ্রহণ করতে পারে।
* শ্রেণি ও যোগ্যতানুসারে দাওয়াত: তাঁরা বুঝতে পারতেন যে, একজন ক্ষমতাধর নেতার কাছে দাওয়াতের ভাষা একরকম হবে, আবার একজন সাধারণ শ্রমিকের কাছে আরেকরকম। যেমন, হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনের দিকে পাঠানোর সময় রাসূল (সা.) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন প্রথমে তাদের তাওহীদের দিকে আহ্বান করেন—একদম মৌলিক বিষয় দিয়ে শুরু করেন। "তুমি যদি তাদের কাছে যাও, তবে তাদেরকে সর্বপ্রথম সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।"এটিই হলো দাওয়াতে হিকমত বা প্রজ্ঞার প্রথম পাঠ।
"তুমি যদি তাদের কাছে যাও, তবে তাদেরকে সর্বপ্রথম সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।" (সহীহ বুখারী, যাকাত অধ্যায়)। এটিই হলো দাওয়াতে হিকমত বা প্রজ্ঞার প্রথম পাঠ।

* উত্তম উপদেশ (মও'ইজাতুল হাসানাহ)
দাওয়াতের মূলকথা শুধু নির্দেশ দেওয়া নয়, বরং এমনভাবে উপদেশ দেওয়া যাতে তা হৃদয়ে দাগ কাটে। সাহাবীরা (রা.) উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোর ভাষা বা তিরস্কার ব্যবহার করতেন না। তাঁদের উপদেশের মূলমন্ত্র ছিল কল্যাণ কামনা এবং ভালোবাসা।
* দাওয়াতের কুরআনিক নির্দেশনা: আল্লাহ তাআলা তাঁর পথে আহ্বানের তিনটি মূলনীতির কথা বলেছেন—এর মধ্যে একটি হলো উত্তম উপদেশ। সোর্স: "তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে, এবং তাদের সাথে বিতর্ক করো সুন্দর পন্থায়।" (সূরা নাহল ১৬:১২৫)।

সাহাবীরা (রা.) জানতেন, উত্তম উপদেশের মাধ্যমেই কেবল মানুষকে জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের আশা দেখিয়ে সত্যের দিকে আকৃষ্ট করা সম্ভব। তাঁদের দাওয়াত ছিল কেবল তথ্য পরিবেশন নয়, বরং আত্মার চিকিৎসা।

২.৩. দাওয়াতের সূচনা: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর আহ্বান

সাহাবায়ে কেরামের (রা.) দাওয়াতী কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিবর্তনীয় মূলনীতি ছিল—তাঁরা সর্বদা দাওয়াতের সূচনা করতেন মৌলিক তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বের আহ্বান দিয়ে। তাঁদের দাওয়াত কখনোই ছোটখাটো মাসআলা, সামাজিক রীতিনীতি, বা শাখা-প্রশাখার বিষয় দিয়ে শুরু হয়নি, বরং তা শুরু হয়েছিল ইসলামের মূল স্তম্ভ, অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই) এই কালিমার মাধ্যমে।

ক. দাওয়াতের মূল ভিত্তি

সাহাবীরা (রা.) রাসূল (সা.)-এর ২৫ বছরের দাওয়াতী জীবন থেকে এই শিক্ষা লাভ করেছিলেন যে, একজন মানুষের হৃদয়ে ইসলামের ভিত্তি তখনই মজবুত হয় যখন তার বিশ্বাস বা আকীদা সঠিক হয়। আকীদা ঠিক না হলে ইবাদত, আমল ও নৈতিকতা সবই মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

• রাসূলের (সা.) নির্দেশনা: রাসূল (সা.) যখন তাঁর সাহাবীদেরকে দূরবর্তী এলাকায় দাওয়াতের জন্য প্রেরণ করতেন, তখন তিনি স্পষ্ট করে বলে দিতেন যে, তাঁদের দাওয়াত কী দিয়ে শুরু করতে হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) যখন হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনের দিকে পাঠান, তখন বলেছিলেন, "তুমি আহলে কিতাবদের এক কওমের কাছে যাচ্ছ। তাদের সর্বপ্রথম তুমি আল্লাহর ইবাদতের সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল।"

এই হাদীসটি সাহাবীদের দাওয়াতী পদ্ধতির মূল কাঠামো নির্ধারণ করে দেয়। তাঁদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—যখন এই মূল ভিত্তি মজবুত হবে, তখনই কেবল সালাত, যাকাত ও অন্যান্য বিধানের কথা বলতে হবে।

খ. প্রথম অগ্রাধিকার

মক্কী জীবনের তেরো বছর ধরে সাহাবীরা (রা.) কেবল এই কালিমার প্রচার করেছেন এবং এর অর্থ ও দাবিকে মানুষের হৃদয়ে গেঁথে দেওয়ার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁরা মানুষকে বুঝিয়েছেন যে, এর অর্থ শুধু মুখে বলা নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

সাহাবীদের (রা.) এই পদ্ধতি থেকে আধুনিক দাওয়াতকারীদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, কোনো সমাজের সংস্কার বা পরিবর্তনের জন্য প্রথমে প্রয়োজন মানুষের ঈমান ও আকীদার পরিশুদ্ধি, তারপর বাকি সব বিষয়। এটিই ছিল সাহাবীদের দাওয়াতের চিরন্তন সূচনা।

২.৪. ব্যক্তিগত দাওয়াত: প্রথম যুগের অগ্রপথিকগণ

সাহাবায়ে কেরামের (রা.) দাওয়াতী কাজের সূচনা এবং প্রাথমিক সফলতা এসেছিল মূলত ব্যক্তিগত দাওয়াত (Individual Calling)-এর মাধ্যমে। প্রথম দিকে প্রকাশ্যে বড় জমায়েতে দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ ছিল না। তাই তাঁরা এমন একটি পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলেন, যা নীরবে, গোপনে এবং অত্যন্ত কার্যকরভাবে ইসলামের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

ক. দাওয়াতের প্রথম স্তর: ব্যক্তিগত সম্পর্ক

সাহাবীরা (রা.) তাঁদের দাওয়াতকে অপরিচিতদের দিকে ছুড়ে দেননি, বরং ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং বিশ্বস্ত পরিচিতজনদের ওপর মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা প্রথমে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে দাওয়াতের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতেন। ব্যক্তিগত দাওয়াতের এই পদ্ধতি মানুষকে নিরাপত্তা ও আস্থা দিত, ফলে তারা খোলা মন নিয়ে দাওয়াত গ্রহণ করতে পারত।

* অগ্রপথিকগণ: এই পদ্ধতির প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)। তিনি ছিলেন মক্কার একজন অত্যন্ত সম্মানিত ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী। ইসলামের দাওয়াত পাওয়ার পর তিনি নিঃস্বার্থভাবে তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু এবং পরিচিতদের কাছে দাওয়াত পৌঁছাতে শুরু করেন। তাঁর দাওয়াতেই ইসলাম গ্রহণ করেন—হযরত উসমান (রা.), হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.), হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.), হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.), এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-এর মতো মহান সাহাবীগণ। এই মুষ্টিমেয় মানুষরাই পরবর্তীতে ইসলামের পতাকাবাহী হয়েছিলেন।

খ. গোপনীয়তা ও ইখলাস

প্রথম যুগের এই দাওয়াত ছিল অত্যন্ত গোপনীয়। এই গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছিল নিরাপত্তার জন্য, কিন্তু এর মাধ্যমে দাওয়াতের ইখলাস (আন্তরিকতা) বৃদ্ধি পেয়েছিল। যারা এই কঠিন পরিস্থিতিতে দাওয়াত গ্রহণ করতেন, তাঁদের ঈমান হতো দৃঢ় এবং নিঃস্বার্থ।

* আন্তরিকতার প্রভাব: ব্যক্তিগত দাওয়াতের ফলে দাওয়াতকারী এবং আমন্ত্রিত ব্যক্তির মধ্যে একটি গভীর আধ্যাত্মিক সংযোগ তৈরি হয়। দাওয়াতকারী দেখাতেন যে, তিনি সত্যিই দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির পরকালীন কল্যাণ চান। এটিই ছিল তাঁদের সফলতার চাবিকাঠি।

ব্যক্তিগত দাওয়াত হলো ইসলামের শিকড় মজবুত করার এক tried and tested পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মাধ্যমেই সাহাবায়ে কেরাম (রা.) একটি ছোট দল থেকে একটি বিশাল উম্মতে পরিণত হয়েছিলেন।

২.৫. আমলী দাওয়াত: চরিত্র ও আচরণের মাধ্যমে আহ্বান নিয়ে নিচে আলোচনা শুরু করছি।

সাহাবায়ে কেরামের (রা.) দাওয়াত কেবল মুখের কথায় সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি ছিল তাঁদের জীবন্ত চরিত্র ও বাস্তব আমলের প্রতিচ্ছবি। ইসলামের দাওয়াতের এই পদ্ধতিকে বলা হয় আমলী দাওয়াত। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, জিহ্বা দিয়ে উচ্চারিত শত শত শব্দের চেয়ে একটি উত্তম চরিত্র অধিক শক্তিশালী প্রভাব ফেলে।

ক. চরিত্রই শ্রেষ্ঠ দাওয়াত

সাহাবীরা (রা.) যে সমাজে দাওয়াত দিতেন, সেখানে মিথ্যাচার, ওয়াদা ভঙ্গ, মদপান এবং অন্যান্য চারিত্রিক দুর্বলতা ছিল সাধারণ ব্যাপার। ইসলামের সুমহান নৈতিকতা তাঁদের আচরণের মাধ্যমে সমাজের সামনে দৃশ্যমান হয়ে ওঠেছিল। যখন একজন অমুসলিম দেখত যে, একজন মুসলিম সাহাবী সর্বোচ্চ সততা, আমানতদারী ও বিনয় বজায় রাখছেন, তখন তার মন ইসলামের প্রতি স্বভাবতই আকৃষ্ট হতো।

* আমানতদারী: রাসূল (সা.)-এর উপাধি ছিল 'আল-আমিন' (বিশ্বস্ত)। সাহাবীরাও এই গুণটি ধারণ করেছিলেন। তাঁদের ব্যবসায়িক লেনদেন ও সামাজিক সম্পর্কগুলোতে এই আমানতদারী এতটাই স্পষ্ট ছিল যে, বহু লোক কেবল এই চারিত্রিক মাধুর্য দেখেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

খ. নীরব আহ্বানকারীর ভূমিকা

আমলী দাওয়াতের একটি বিশেষ দিক হলো এটি একটি নীরব আহ্বানকারী। দাওয়াতকারী হয়তো কোনো কথা বলছেন না, কিন্তু তাঁর জীবনযাত্রা, ইবাদতের একাগ্রতা, অভাবীর প্রতি দয়া, এবং প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ—এ সবই ইসলামের দিকে নীরবে আহ্বান জানাচ্ছে।

* জীবন্ত উদাহরণ: যখন সাহাবীরা (রা.) নতুন নতুন অঞ্চলে যেতেন, সেখানকার মানুষজন তাদের আচরণ দেখে মুগ্ধ হতো। তাদের ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা এতটাই প্রখর ছিল যে, বহু অমুসলিম দেশ ও জাতি কেবল তাঁদের জীবনধারা দেখেই ইসলামকে সত্য ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। পরবর্তীকালে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ার মতো অঞ্চলে বণিক সাহাবীদের মাধ্যমে ইসলামের বিস্তৃতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সাহাবীদের (রা.) দাওয়াতী নীতি ছিল: প্রথমে নিজে ইসলাম অনুযায়ী চলো, তারপর অন্যকে সেই পথে আহ্বান করো। তাঁরা নিজেরাই ইসলামের জীবন্ত সংবিধান হয়ে উঠেছিলেন। এই আমলী দাওয়াতের ফলেই তাঁদের কথাগুলো মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল।

তৃতীয় অধ্যায়:সাহাবীদের দাওয়াতের কৌশল ও কর্মপদ্ধতি

৩.১. ধৈর্য ও সহনশীলতা: মক্কী জীবনের কঠিন পরীক্ষা

সাহাবায়ে কেরামের (রা.) দাওয়াতী জীবনের প্রথম ও প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল ধৈর্য (সবর) ও সহনশীলতা বজায় রাখা। মক্কার প্রাথমিক দিনগুলোতে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া ছিল অত্যন্ত বিপদজনক। বিরুদ্ধবাদীরা শারীরিক নির্যাতন, মানসিক চাপ এবং সামাজিক বয়কটের মাধ্যমে সাহাবীদের (রা.) ঈমান ও মনোবল ভেঙে দিতে চেয়েছিল। এই প্রতিকূল পরিবেশে সাহাবীরা (রা.) যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, তা তাঁদের দাওয়াতকে টিকিয়ে রেখেছে এবং ইসলামের শিকড়কে মজবুত করেছে।
ক. দাওয়াতের জন্য সবরের অপরিহার্যতা:

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে দাওয়াতকারীদের জন্য ধৈর্যকে অপরিহার্য শর্ত হিসেবে বারবার উল্লেখ করেছেন। দাওয়াতের পথে বাধা, অপমান এবং প্রত্যাখ্যান আসবেই—এই মানসিক প্রস্তুতি সাহাবীদের ছিল।

আল্লাহ তাআলা রাসূল (সা.)-কে লক্ষ্য করে বলেন: "সুতরাং আপনি ধৈর্য ধারণ করুন, যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।"

এই নির্দেশের অনুসরণ করে, সাহাবীরা (রা.) ব্যক্তিগত প্রতিশোধ বা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার পথে না গিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে ধৈর্য ধারণ করেছেন।

খ. মক্কী জীবনের বাস্তব উদাহরণ
মক্কী জীবন ছিল সাহাবীদের সবরের প্রধান পরীক্ষাস্থল।

* আম্মার (রা.)-এর পরিবার: হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.), তাঁর পিতা ইয়াসির (রা.) এবং মাতা সুমাইয়া (রা.)-কে নির্মমভাবে নির্যাতন করা হতো। সুমাইয়া (রা.) ইসলামের পথে প্রথম শহিদ। রাসূল (সা.) তাঁদের নির্যাতন সহ্য করতে দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন: "হে ইয়াসির পরিবার! ধৈর্য ধারণ করো। তোমাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে।" (আল-হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী, আল-ইসাবাহ)। এই চরম নির্যাতনের মুখেও আম্মার (রা.) ঈমান ত্যাগ করেননি।

* হযরত বেলাল (রা.): উমাইয়া ইবনে খালাফ তাঁকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালিতে চিৎ করে শুইয়ে বুকে ভারী পাথর চাপা দিয়ে রাখত, তবুও তিনি "আহাদ! আহাদ!" (আল্লাহ এক! আল্লাহ এক!) বলে অবিচল থাকতেন।

গ. দাওয়াতে সহনশীলতার প্রভাব
এই ধৈর্য ও সহনশীলতা দাওয়াতের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী বার্তা দিত: এই ধর্ম কোনো ক্ষণস্থায়ী আবেগ বা দুনিয়ার স্বার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়; এটি সুদৃঢ় বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই অটলতাই অমুসলিমদেরকে ইসলামের গভীরতা নিয়ে ভাবতে বাধ্য করত এবং বহু হৃদয়কে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেছিল।

৩.২. মানুষকে ভালোবাসার মাধ্যমে দাওয়াত

সাহাবায়ে কেরামের (রা.) দাওয়াত ছিল মূলত মানবতার প্রতি ভালোবাসা ও কল্যাণকামিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, দাওয়াত কোনো বিচারকের রায় নয়, বরং এটি একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে আরোগ্য দান করার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। এই ভালোবাসা ছিল তাঁদের দাওয়াতী কাজের চৌম্বক শক্তি, যা মানুষকে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করত।

ক. কল্যাণকামিতা: দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য:

সাহাবীরা (রা.) যখন কোনো অমুসলিম বা পাপীকে দাওয়াত দিতেন, তখন তাঁদের মনে কোনো ঘৃণা বা অহংকার কাজ করত না। বরং তাঁরা গভীর দরদ নিয়ে ভাবতেন যে, এই মানুষটি যদি ঈমান না আনে, তবে সে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে। এই পরকালীন চিন্তাধারা থেকেই তাঁদের মনে জন্ম নিত প্রকৃত কল্যাণকামিতা।

* রাসূলের (সা.) আদর্শ: সাহাবীরা (রা.) সরাসরি রাসূল (সা.)-এর জীবন থেকে এই ভালোবাসা শিখেছিলেন। আল্লাহ তাআলা রাসূল (সা.) সম্পর্কে বলেন:
"তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে একজন রাসূল এসেছেন; তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর কাছে অসহনীয়, তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি করুণাময়, পরম দয়ালু।"

সাহাবীরা (রা.) রাসূলের (সা.) এই কল্যাণকামিতা নিজেদের মধ্যে ধারণ করেছিলেন এবং দাওয়াতের সময় তা প্রকাশ করতেন।

খ. আচরণে ভালোবাসার প্রকাশ

তাঁদের ভালোবাসা শুধু মৌখিক ছিল না; তা প্রকাশ পেত ব্যবহারিক জীবনে:

১. কোমলতা ও সহমর্মিতা: তাঁরা সমাজের দুর্বল, দরিদ্র এবং দাসদের প্রতিও একই বিনয় ও সম্মান দেখাতেন, যা শক্তিশালী ও ধনী ব্যক্তিদের প্রতি দেখাতেন। এই সমতা ও সম্মান মানুষকে ইসলামের সাম্যের প্রতি আকৃষ্ট করত।

২. প্রয়োজন পূরণ: দাওয়াত দেওয়ার পাশাপাশি তাঁরা মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে এবং অভাব মেটাতে সচেষ্ট ছিলেন। যখন মানুষ দেখত যে, একজন মুসলিম তাদের বিপদ-আপদে পাশে দাঁড়াচ্ছে, তখন তারা তাদের দাওয়াতকে সহজেই আন্তরিক বলে গ্রহণ করত।

এই ভালোবাসা ও সহানুভূতি ছিল সাহাবীদের দাওয়াতের ভিত্তিপ্রস্তর। মানুষ দ্বীন গ্রহণ করত, কারণ তারা জানত এই আহ্বানের পেছনে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই, আছে শুধু তাদের প্রতি গভীরতম মমতা।

৩.৩. সম্পর্ক তৈরি ও প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে দাওয়াত

সাহাবায়ে কেরামের (রা.) দাওয়াতী কাজের অন্যতম কার্যকর কৌশল ছিল মানুষের সাথে প্রথমে আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি করা এবং তাদের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানো। তাঁরা শুধুমাত্র ধর্মীয় উপদেশ দিতেন না, বরং সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনেও মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে উঠতেন। যখন একজন মানুষ দেখত যে, দাওয়াতকারী সত্যিই তার ব্যক্তিগত ও পার্থিব কল্যাণে আগ্রহী, তখন সে সেই দাওয়াতকে আরো সহজে গ্রহণ করত।

ক. সম্পর্ক স্থাপন (Building Trust)

সাহাবীরা (রা.) দাওয়াত দেওয়ার আগে টার্গেট ব্যক্তির সাথে একটি সৌম্য, আস্থা ও ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি করতেন। এই সম্পর্ক তৈরিতে সাহায্য করত:

১. সদাচরণ ও বিনয়: সমাজের সকল স্তরের মানুষের সাথে তাঁরা হাসিমুখে কথা বলতেন এবং উত্তম আচরণ করতেন। এই আচরণের মাধ্যমে তাঁরা প্রমাণিত করতেন যে, ইসলাম মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে না, বরং সম্পর্ক গড়ে তোলে।

২. বিশ্বাসযোগ্যতা: তাঁরা ওয়াদা রক্ষা করতেন, আমানতের খেয়ানত করতেন না এবং ব্যবসায়িক লেনদেনে সর্বদা সততা বজায় রাখতেন। এই বিশ্বাসযোগ্যতা তাঁদের দাওয়াতের ভিত্তি মজবুত করত।

খ. প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে দাওয়াত:

মানুষের ব্যক্তিগত বা সামাজিক প্রয়োজন পূরণ করা হলো দাওয়াতের পথকে সহজ করার এক নববী কৌশল। সাহাবীরা (রা.) শুধু ঈমানের কথা বলতেন না, বরং বাস্তব সমস্যা সমাধানেও এগিয়ে আসতেন।

* বিপদ-আপদে পাশে থাকা: তারা প্রতিবেশীর অসুস্থতায় সেবা করতেন, অভাবীকে সাহায্য করতেন এবং ঋণী ব্যক্তিকে সহযোগিতা করতেন। যখন কোনো ব্যক্তি দেখত যে, ইসলামের অনুসারীরা নিঃস্বার্থভাবে তার পাশে দাঁড়াচ্ছে, তখন তার হৃদয় ইসলামের প্রতি উন্মুক্ত হয়ে যেত।

* আকর্ষণ ও আস্থা: এই কৌশলটি মূলত দাওয়াতের প্রতি মানুষের মনে আস্থা ও আকর্ষণ সৃষ্টি করত। হযরত খাওলাহ বিনতে সা'লাবাহ (রা.)-এর মতো নারী সাহাবীরাও সমাজের দুর্বল নারীদের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে দাওয়াত দিতেন।

৩.৪. সামাজিক সংস্কারে সাহাবীদের ভূমিকা

সাহাবায়ে কেরামের (রা.) দাওয়াত কেবল ব্যক্তি-পর্যায়ে ধর্মীয় উপদেশ দেওয়াই ছিল না; এটি ছিল সমাজের সামগ্রিক অন্যায়, অবিচার ও নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে এক বিপ্লবী সংস্কার আন্দোলন। তাঁরা দাওয়াতের মাধ্যমে একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন, যেখানে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মানুষের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে।

ক. অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার অবস্থান (নাহী আনিল মুনকার)

সাহাবীদের দাওয়াতের দ্বিতীয় মূল স্তম্ভ ছিল 'নাহী আনিল মুনকার' (অসৎকাজে নিষেধ করা)। তাঁরা সমাজের প্রতিষ্ঠিত কুসংস্কার, মূর্তিপূজা, দাস প্রথা, সুদের লেনদেন, এবং নারীর প্রতি অবিচারের মতো গুরুতর অন্যায়গুলোকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

* বিলালের (রা.) মুক্তি: হযরত বেলাল (রা.)-এর মতো দাসদের প্রতি যে অমানবিক আচরণ করা হতো, ইসলাম তা কঠোরভাবে নিষেধ করে। হযরত আবু বকর (রা.) নিজ সম্পদ ব্যয় করে দাসদের মুক্তি দিয়ে সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বার্তা দিয়েছিলেন। এটি ছিল দাওয়াতের মাধ্যমে সামাজিক সংস্কারের এক বাস্তব উদাহরণ।

* মদ ও জুয়া উচ্ছেদ: মদ ও জুয়া ছিল তৎকালীন সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কুরআনের নির্দেশ আসার সাথে সাথেই সাহাবীরা (রা.) দ্বিধাহীন চিত্তে এই সামাজিক ব্যাধিগুলো নির্মূল করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, যা সমাজে রাতারাতি নৈতিক শুদ্ধতা এনেছিল।

খ. ইনসাফ ও সমতা প্রতিষ্ঠা

সাহাবীরা (রা.) সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে ইনসাফ (ন্যায়) ও সমতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন যে, ইসলামের দৃষ্টিতে সাদা-কালোর, ধনী-দরিদ্রের এবং আরবী-অনারবীর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই।

গ. দাওয়াত ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

সাহাবীরা (রা.) মানুষকে বোঝাতেন যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা শুধু মসজিদে সীমাবদ্ধ নয়। একজন মুসলিমের দায়িত্ব হলো তার চারপাশের সমাজকেও আল্লাহর নির্দেশিত পথে নিয়ে আসা। এই সামাজিক দায়বদ্ধতাই তাঁদের দাওয়াতকে ব্যাপক ও প্রভাবশালী করে তুলেছিল।

৩.৫. কঠিন পরিস্থিতিতে সাহসিকতার সাথে দাওয়াত

সাহাবায়ে কেরামের (রা.) দাওয়াতী পদ্ধতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল—ভয়ঙ্কর ও কঠিনতম পরিস্থিতিতেও সত্যের উপর অটল থাকা এবং সাহসিকতার সাথে দাওয়াত পেশ করা। তাঁদের এই নির্ভীকতাই বহু মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেছিল, কারণ তারা দেখত এই দাওয়াতকারীরা তাদের বিশ্বাসের জন্য জীবন বাজি রাখতেও প্রস্তুত।

ক. নির্ভীকতার আদর্শ: হযরত উমর (রা.)
রাসূল (সা.)-এর দাওয়াতী জীবনের প্রথম দিকে যখন দুর্বল সাহাবীরা গোপনে ইবাদত করতেন, তখন হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পর প্রকাশ্য দাওয়াতের সূচনা হয়। তাঁর মতো শক্তিশালী ও সাহসী ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ অন্যদের মধ্যে সাহস ও মনোবল যুগিয়েছিল।

 * প্রকাশ্য হিজরত: উমর (রা.) যখন হিজরত করেন, তখন তিনি মক্কার কাফিরদের নেতা কুরাইশদের সামনে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, "যে তার স্ত্রীকে বিধবা করতে চায় এবং তার সন্তানকে এতিম বানাতে চায়, সে যেন এই উপত্যকার ওপারে আমার মোকাবেলা করতে আসে!" তাঁর এই ঘোষণা মক্কার পরিবেশ বদলে দিয়েছিল।

খ. সত্য প্রচারে অদম্য স্পৃহা
সাহাবীরা (রা.) কখনো নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তিত থাকতেন না, বরং তাঁদের প্রধান চিন্তা ছিল—কীভাবে আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়।

 * যুদ্ধক্ষেত্রে দাওয়াত: শুধুমাত্র শান্তিকালীন নয়, সাহাবীরা (রা.) যুদ্ধক্ষেত্রেও দাওয়াতের কাজ করতেন। যুদ্ধের আগে প্রতিপক্ষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানো ছিল তাঁদের নীতি, যা প্রমাণ করে যে, দাওয়াত তাঁদের কাছে জিহাদের চেয়েও মৌলিক কাজ ছিল।

 * হযরত হামযা (রা.) ও বীরত্ব: হযরত হামযা (রা.)-এর মতো বীর পুরুষের ইসলাম গ্রহণ কুরাইশদের দাওয়াতী কাজে বাধা দেওয়ার মনোবল ভেঙে দিয়েছিল। এই সাহাবীরা প্রকাশ্য সমাবেশে দাঁড়িয়ে সত্যের পক্ষে কথা বলতে কখনোই দ্বিধা করেননি, এমনকি যখন তাঁদের জীবন বিপন্ন ছিল তখনও।

এই সাহসিকতা ছিল ইখলাস ও দৃঢ় ঈমানের ফসল। সাহাবীরা (রা.) জানতেন যে, তাঁদের নিরাপত্তা দুনিয়াবী শক্তির হাতে নয়, বরং আল্লাহর হাতে। এই অদম্য স্পৃহাই দাওয়াতকে একটি স্থিতিস্থাপক আন্দোলনে পরিণত করেছিল।

চতুর্থ অধ্যায়: হযরত আবু বক্কর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালার দাওয়াত

৪.১. ব্যক্তিগত প্রভাব :

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম দিকের দাওয়াতী কাজের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর দাওয়াতী পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব, চারিত্রিক বিশ্বস্ততা এবং সামাজিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাঁর দাওয়াতী কৌশল ছিল অত্যন্ত শান্ত, ব্যক্তিগত এবং ফলপ্রসূ।

ক. আস্থার পুঁজি ও প্রভাব:

ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও আবু বকর (রা.) মক্কায় একজন সৎ ব্যবসায়ী, উদার এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের নেতৃস্থানীয়দের একজন এবং বংশতত্ত্ব (আনসাব) বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করত, ভালোবাসত এবং তাঁর কাছে পরামর্শ চাইত।

* বিশ্বস্ততার চাবিকাঠি: তিনি যখন ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন তা নতুন কোনো ধর্মীয় প্রচারকের বাণী হিসেবে নয়, বরং তাঁর দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছ থেকে আসা এক সত্যের আহ্বান হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াত দাবির পরপরই তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে তা গ্রহণ করেন, যা প্রমাণ করে তাঁর কাছে রাসূল (সা.)-এর ব্যক্তিগত সততা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

খ. কৌশল: নিবেদিত ব্যক্তিগত দাওয়াত

আবু বকর (রা.)-এর দাওয়াতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।

* ব্যক্তিগত পরিচিতিমূলক দাওয়াত: তিনি প্রকাশ্যে বক্তৃতা না দিয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বিশ্বস্ত পরিচিতদের কাছে যেতেন।

* সঠিক নির্বাচন: তিনি এমন ব্যক্তিদের দাওয়াত দিতেন, যাদের সমাজে প্রভাব, সাহস এবং মেধা ছিল। তিনি বুঝেছিলেন, এই কঠিন সময়ে ইসলামের ভিত্তি মজবুত করতে হলে শক্তিশালী ঈমানদার প্রয়োজন।

* দাওয়াতের ফল: তাঁর দাওয়াতেই ইসলামের ইতিহাসে পাঁচজন শ্রেষ্ঠ সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেন, যাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে: হযরত উসমান (রা.), হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.), হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.), হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.), এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)।

হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর দাওয়াত দেখিয়েছিল যে, উত্তম চরিত্র এবং সামাজিক আস্থা যেকোনো দাওয়াতী মিশনের জন্য কতটা শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে।

৪.২. হযরত মুস‘আব ইবনে উমায়ের (রা.)

* মদীনায় ইসলামের দূত :

হযরত মুস‘আব ইবনে উমায়ের (রা.)-এর দাওয়াতী জীবন প্রমাণ করে যে, সাহাবীদের দাওয়াতের সফলতা নির্ভর করত জ্ঞানের গভীরতা, চরিত্রের মাধুর্য এবং সাংগঠনিক প্রজ্ঞার ওপর, সম্পদের প্রাচুর্য বা বংশীয় মর্যাদার ওপর নয়। তিনি ছিলেন মদীনায় প্রেরিত ইসলামের প্রথম আনুষ্ঠানিক দূত বা শিক্ষক।

ক. নিয়োগ ও পটভূমি:

মুস‘আব (রা.) ছিলেন মক্কার অন্যতম ধনী ও বিলাসী যুবক। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি সব সুখ-সুবিধা ত্যাগ করে কঠিন জীবন বেছে নেন। যখন মদীনার আউস ও খাজরায গোত্রের কিছু লোক মক্কায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন (আকাবার প্রথম শপথ), তখন তারা রাসূল (সা.)-এর কাছে এমন একজনকে চাইলেন, যিনি তাঁদের কাছে ইসলাম শিক্ষা দেবেন এবং দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করবেন।

রাসূল (সা.) এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য মুস‘আব ইবনে উমায়ের (রা.)-কে নির্বাচন করেন। এই নির্বাচন ছিল প্রজ্ঞাপূর্ণ; কারণ মুস‘আব (রা.) ছিলেন অত্যন্ত মধুরভাষী, কুরআনের হাফেজ এবং চমৎকার চরিত্রের অধিকারী।

খ. দাওয়াতের কৌশল ও প্রজ্ঞা

মদীনায় গিয়ে মুস‘আব (রা.) দাওয়াতী কাজে যে প্রজ্ঞা দেখিয়েছেন, তা অনুসরণীয়।

১. কোমলতা ও যুক্তি: তিনি মদীনার নেতা ও সাধারণ জনগণের কাছে অত্যন্ত নম্রতা ও উত্তম যুক্তির সাথে দাওয়াত পেশ করেন।

২. কুরআন তিলাওয়াত: তাঁর দাওয়াতের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র ছিল কুরআনের সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহী তিলাওয়াত। তাঁর তিলাওয়াত শুনে বহু কঠোর হৃদয়ের মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

* সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-এর ঘটনা: মদীনার অন্যতম নেতা সা'দ ইবনে মু'আয (রা.) দাওয়াত থামাতে এসে প্রথমে কঠোর হন। কিন্তু মুস‘আব (রা.) তাঁকে নম্রভাবে বসতে এবং কুরআন শুনতে আহ্বান জানান। কুরআন শুনেই সা'দ (রা.)-এর হৃদয়ে পরিবর্তন আসে এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে তাঁর গোত্রের প্রায় সবাই ইসলাম গ্রহণ করে।

গ. অভূতপূর্ব সাফল্য

মুস‘আব (রা.)-এর দাওয়াত এতটাই সফল হয়েছিল যে, পরের বছর (আকাবার দ্বিতীয় শপথের সময়) মদীনা থেকে সত্তরজনেরও বেশি সাহাবী রাসূল (সা.)-এর কাছে মক্কায় এসে পৌঁছান। মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের আলো পৌঁছে গিয়েছিল, যা হিজরতের পথকে সুগম করে। তাঁকে মদীনার 'আল-মুকরি' (কুরআন তিলাওয়াতকারী) বা প্রথম কূটনৈতিক বলা হয়। মুস‘আব (রা.) প্রমাণ করেছিলেন যে, একটি নতুন সমাজে ইসলামের বীজ বপন করতে হলে ব্যক্তিগত গুণাবলী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রচার অপরিহার্য।

৪.৩. হযরত উমর (রা.)-এর দাওয়াত:

* সত্যের নির্ভীক প্রকাশ:

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর দাওয়াতী জীবন একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত। তাঁর দাওয়াতী কৌশল ছিল নির্ভীকতা, কঠোরতা ও প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে সেই ব্যক্তিত্ব, যাঁর ইসলাম গ্রহণ মক্কার দাওয়াতী কার্যক্রমকে গোপনীয়তা থেকে প্রকাশ্যতায় নিয়ে এসেছিল।

ক. ইসলাম গ্রহণের প্রভাব:

উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ছিলেন কুরাইশদের অন্যতম শক্তিশালী ও ভয়ংকর নেতা। তাঁর ইসলামের প্রতি বৈরী মনোভাব ছিল অত্যন্ত কট্টর। কিন্তু যখন তিনি সত্যের সন্ধান পেলেন, তখন তাঁর সেই কঠোরতা ইসলামের শত্রুদের দিকে ধাবিত হলো। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিল মুসলিমদের জন্য একটি বিশাল বিজয় (ফাতহ) এবং দাওয়াতী কাজের জন্য এক নতুন দিকের উন্মোচন।

* প্রকাশ্য ইবাদতের সূচনা: উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করেন: "আমরা কি সত্যের উপর নই? তিনি বললেন: অবশ্যই। উমর (রা.) বললেন: তাহলে কিসের

ভয়? আমরা কেন লুকিয়ে থাকব?" এরপর তিনি সাহাবীদের নিয়ে দুই কাতারে প্রকাশ্যে কা'বাতে গিয়ে সালাত আদায় করেন। এটি ছিল দাওয়াতের ইতিহাসে এক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা।

খ. কৌশল: অদম্য সাহস ও কর্তৃত্বের ব্যবহার
হযরত উমর (রা.) তাঁর দাওয়াতী কাজে তাঁর শারীরিক শক্তি, সামাজিক কর্তৃত্ব এবং অদম্য সাহসকে ব্যবহার করেছিলেন।

১. প্রতিবন্ধকতা অপসারণ: তিনি দাওয়াতের পথে আসা ভয়-ভীতি ও বাধাগুলোকে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে অপসারণ করেন। তাঁর এই পদক্ষেপ দুর্বল সাহাবীদেরকে মানসিক শক্তি জুগিয়েছিল।

২. আস্থার সৃষ্টি: উমর (রা.)-এর মতো একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির উপস্থিতি মানুষের মনে এই আস্থা সৃষ্টি করেছিল যে, ইসলাম কোনো দুর্বলদের ধর্ম নয়, এটি সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে একটি শক্তিশালী আন্দোলন।

গ. উমর (রা.)-এর শিক্ষা:
হযরত উমর (রা.)-এর দাওয়াতী পদ্ধতি শিখিয়েছিল যে, প্রয়োজন সাপেক্ষে এবং ইখলাসের ভিত্তিতে দাওয়াতের ভাষা ও কৌশল পরিবর্তিত হতে পারে। যেখানে নরম সুর কাজ করে না, সেখানে সত্যের অদম্য ও প্রকাশ্য ঘোষণা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তাঁর নির্ভীকতা মক্কার ইসলাম-বিরোধীদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল এবং মুসলিমদের দাওয়াতী কার্যক্রমের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করেছিল।

৪.৪. দাওয়াতের জন্য সাহাবীদের দূর-দূরান্তে হিজরত ও কুরবানি

সাহাবায়ে কেরামের (রা.) দাওয়াতী কাজ শুধু মক্কা বা মদীনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ইসলামের বার্তা পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁরা অভূতপূর্ব ত্যাগ, কুরবানি এবং দূর-দূরান্তে হিজরত করেছিলেন। এই ত্যাগ প্রমাণ করে যে, আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া তাঁদের কাছে জীবনের প্রধান ব্রত ছিল, ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ বা মাতৃভূমির প্রতি মোহ তাঁদের কাছে গৌণ ছিল।

ক. حب الوطن-এর ঊর্ধ্বে দাওয়াত (স্বদেশপ্রেমের ঊর্ধ্বে দাওয়াত)

সাহাবীরা (রা.) তাঁদের জন্মভূমি মক্কাকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। কিন্তু যখন দ্বীনের প্রয়োজনে রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে আবিসিনিয়ায় (বর্তমান ইথিওপিয়া) কিংবা মদীনায় হিজরতের নির্দেশ এল, তখন তাঁরা বিনা দ্বিধায় সেই কুরবানি স্বীকার করে নিলেন।

* আবিসিনিয়ার প্রথম হিজরত: মক্কার কাফিরদের নির্যাতন থেকে নিজেদের ঈমান রক্ষা এবং দাওয়াতকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রথম দিকে সাহাবীদের একটি দল আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানে তাঁরা সে দেশের রাজার সামনে ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করেন। এটি ছিল দাওয়াতের জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ।

খ. বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিস্তার:

নবীজির (সা.) ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের আলোকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া।

১. সিরিয়া ও ইরাক: হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-এর মতো বীর সেনাপতি এবং অন্যান্য সাহাবীরা শুধু সামরিক বিজয়ের জন্য যাননি, বরং তাঁরা প্রতিটি বিজিত অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়েছিলেন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

২. ভারতবর্ষ ও দূর প্রাচ্য: বহু সাহাবী (যেমন: মালিক ইবনে দীনার (রা.) প্রমুখ) ব্যবসা বা ভ্রমণের নামে ভারত, চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দূরবর্তী অঞ্চলে পাড়ি জমান। তাঁরা নিজেদের উত্তম চরিত্র ও আমলী দাওয়াতের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করেন।

গ. দাওয়াতের জন্য কুরবানি: দাওয়াতেরএই হিজরতগুলো ছিল সীমাহীন কষ্টের, পরিবার-পরিজন, সহায়-সম্পদ এবং পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন, প্রতিকূল পরিবেশে যাওয়া। এই কুরবানিই তাঁদের দাওয়াতকে মানুষের হৃদয়ে আন্তরিকতা ও সততার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছিল। সাহাবীরা (রা.) প্রমাণ করেছিলেন যে, দাওয়াত ইলাল্লাহ তাদের কাছে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে বেশি মূল্যবান।

৪.৫. নারী সাহাবীদের দাওয়াতী ভূমিকা

ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রমকে পূর্ণতা দিতে নারী সাহাবায়ে কেরামদের (রা.) ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিসীম। পুরুষ সাহাবীদের মতো তাঁরা প্রকাশ্যে সামরিক দাওয়াত বা বহুদূর যাত্রা না করলেও, ঘরের অভ্যন্তরে, সামাজিক পরিবেশে এবং নারীদের মাঝে ইসলামের বীজ বপনে তাঁদের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। তাঁদের দাওয়াতী পদ্ধতি ছিল মূলত ব্যক্তিগত প্রভাব ও শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল।

ক. গৃহকোণে দাওয়াত: ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যবহার
নারী সাহাবীরা (রা.) তাঁদের দাওয়াতকে সবচেয়ে কার্যকরভাবে ব্যবহার করেছিলেন পারিবারিক ও সামাজিক গন্ডির মধ্যে। তাঁরা প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ইসলামের নৈতিকতা ও জীবনবিধান তুলে ধরতেন।

* হযরত খাদীজা (রা.): রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াত লাভের পর তিনিই প্রথম ঈমান আনেন এবং রাসূল (সা.)-এর প্রতি মানসিক ও আর্থিক সমর্থন দিয়ে দাওয়াতী কার্যক্রমকে প্রথম থেকেই স্থিতিশীলতা দেন। তাঁর এই সমর্থন ছিল দাওয়াতের জন্য এক বিশাল শক্তি।

* হযরত ফাতিমা বিনতে খাত্তাব (রা.): হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পেছনে তাঁর বোন ফাতিমা (রা.) এবং তাঁর স্বামী সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.)-এর দাওয়াতী ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা গোপনে উমর (রা.)-কে সত্যের পথে আনার জন্য কাজ করছিলেন, যা প্রমাণ করে পরিবারের সদস্যদের প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা ছিল মৌলিক।

খ. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দাওয়াত
নারী সাহাবীরা (রা.) অন্যদের কাছে ইসলামের জ্ঞান, কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন।
* হযরত আয়েশা (রা.): তিনি ছিলেন জ্ঞানের এক অফুরন্ত ভান্ডার। তাঁর মাধ্যমে ইসলামের বহু বিধান, রাসূল (সা.)-এর জীবনধারা এবং পারিবারিক উপদেশ উম্মতের কাছে পৌঁছেছে। বহু পুরুষ সাহাবীও তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এই শিক্ষাদান ছিল দাওয়াতের এক নীরব পদ্ধতি।

 * নারীদের মজলিস: তাঁরা নারীদের জন্য মজলিস বা বৈঠক আয়োজন করতেন, যেখানে দ্বীনের আলোচনা হতো। এর ফলে সমাজের অর্ধেক অংশ—অর্থাৎ নারীরা—সঠিক ইসলামের শিক্ষায় আলোকিত হতেন এবং পরিবারে সেই আলোর সঞ্চার করতেন।

গ. ধৈর্য ও সহনশীলতার দৃষ্টান্ত:

হযরত সুমাইয়া (রা.)-এর মতো নারী সাহাবীগণ দাওয়াতের পথে চরম নির্যাতন ভোগ করেছেন এবং শাহাদাত বরণ করেছেন। তাঁদের এই অটল ধৈর্য ও ঈমানের বলিষ্ঠতা প্রমাণ করে যে, দাওয়াতী কাজে নারী-পুরুষ উভয়েই সমানভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

নারী সাহাবীদের এই নীরব কিন্তু শক্তিশালী দাওয়াতী কার্যক্রমের মাধ্যমেই ইসলাম সমাজে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।

৫ম অধ্যায়:আধুনিক প্রেক্ষাপটে সাহাবীদের দাওয়াতী আদর্শ

আধুনিক প্রেক্ষাপটে সাহাবীদের দাওয়াতী আদর্শের মূল ভিত্তি অপরিবর্তিত, তবে তা প্রয়োগের কৌশল ও ক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের (রা.) দাওয়াতী আদর্শ ছিল মূলত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, যা আজকের দিনেও দাওয়াতের কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য।

আধুনিক প্রেক্ষাপটে সাহাবীদের দাওয়াতী আদর্শের মূলনীতি ও প্রয়োগের দিকগুলি নিচে তুলে ধরা হলো:

৫.১. উন্নত চরিত্র ও আমলের মাধ্যমে দাওয়াত (দাওয়াত বিল-হাল):

দাওয়াতী কাজের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো দাঈ বা আহ্বানকারীর নিজস্ব উন্নত চরিত্র, নৈতিকতা ও আমল। এটি সাহাবায়ে কেরামের দাওয়াতের মূল ভিত্তি ছিল, যা আধুনিক সময়ে আরও বেশি জরুরি।

* কথা ও কাজের সমন্বয়: সাহাবীরা যা বলতেন, নিজেরা আগে তা পালন করতেন। আধুনিক সমাজে যেখানে কথায় ও কাজে গরমিল দেখা যায়, সেখানে আদর্শ জীবনযাপন (Practical Exemplification) দাওয়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল।

* বিনয়, নম্রতা ও ধৈর্য: রাসূল (সা.) ও সাহাবীদের দাওয়াত ছিল অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে, চরমপন্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। বর্তমান যুগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা প্রকাশ্যে যেকোনো মতভেদকে কেন্দ্র করে উগ্র ও রূঢ় ভাষা পরিহার করা এবং মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকা সাহাবীদের আদর্শ।

* মানুষের কল্যাণ কামনা: সাহাবীরা কোনো মানুষকে স্থায়ী শত্রু মনে করতেন না। আধুনিক প্রেক্ষাপটে, দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন না করা এবং তাদের ইতিবাচক দিকের প্রশংসা করার মাধ্যমে হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছানো উচিত।

৫.২. যুগোপযোগী মাধ্যম ও কৌশল ব্যবহার:

সাহাবীরা তাদের সময়ের উপযোগী কৌশল (যেমন পত্র প্রেরণ, প্রতিনিধি দল পাঠানো) ব্যবহার করেছেন। আধুনিক দাঈদেরও নতুন নতুন মাধ্যম ব্যবহার করে দাওয়াতের বার্তা পৌঁছাতে হবে।

* ডিজিটাল দাওয়াত: সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার), ওয়েবসাইট, ব্লগিং—এগুলো আধুনিক দাওয়াতের শক্তিশালী মাধ্যম। সাহাবীদের মতো চিন্তা-গবেষণালব্ধ ও সত্যনিষ্ঠ কন্টেন্ট (Content) এর মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার করা।

* শিক্ষা ও সংস্কৃতি: ইসলাম ও আধুনিক শিক্ষার বাস্তব সমন্বয় সাধন করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। সাংস্কৃতিক মাধ্যম (যেমন: চলচ্চিত্র, ডকুমেন্টারি, সাহিত্য) ব্যবহার করে ইসলামের সৌন্দর্য ও আদর্শ তুলে ধরা।

* সংগঠন ও ঐক্য: সাহাবীদের দাওয়াত ছিল সম্মিলিত ও সুসংগঠিত। আজকের দিনেও দাওয়াতী কাজকে ফলপ্রসূ করতে পরস্পর সহযোগিতা ও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা জরুরি।

৫.৩. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দাওয়াত ও পর্যায়ক্রমিকতা:

সাহাবীদের দাওয়াত ছিল পর্যায়ক্রমিক। তারা প্রথমে তাওহীদ (আল্লাহর একত্ব) ও মৌলিক আকিদার দাওয়াত দিতেন, তারপর বিস্তারিত ইবাদতের দিকে মনোযোগ দিতেন।

* মৌলিক বিষয়ে মনোযোগ: আধুনিক সমাজে নানা শাখা-প্রশাখার মাসয়ালা নিয়ে বাড়াবাড়ি না করে, সাহাবীদের মতো তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের মৌলিক বার্তাটি সবার আগে ও গুরুত্ব সহকারে পৌঁছানো।

* ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা: ইসলাম গ্রহণের জন্য কাউকে বাধ্য না করা (যা চরমপন্থীদের আকিদা) এবং দাওয়াতের ফল দেখতে সময় লাগলেও ধৈর্য ধারণ করা সাহাবীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

* জ্ঞানভিত্তিক দাওয়াত: সাহাবীরা ছিলেন কোরআন ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞানের অধিকারী। আধুনিক দাঈদেরও বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করে, প্রমাণভিত্তিক ও যৌক্তিক উপায়ে দাওয়াত দিতে হবে, যা আধুনিক মননকে আকৃষ্ট করে।

৫.৪. পারিবারিক ও ব্যক্তিগত পরিসরে দাওয়াত:

* নিজেকে ও পরিবারকে রক্ষা: দাওয়াতের প্রধান ক্ষেত্র শুরু হয় নিজ পরিবার থেকে। কোরআনের আয়াত অনুযায়ী, সাহাবীরা প্রথমে নিজে ও পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য দাওয়াতী কাজ করতেন (সূরা আত-তাহরীম: ৬)। এটি আধুনিক পরিবারগুলোর জন্য আদর্শ।

* ঘনিষ্ঠ মহলে দাওয়াত: সাহাবীরা প্রথমে নিকটাত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে দাওয়াত শুরু করেন। বর্তমান যুগেও বন্ধু-মহল এবং কর্মক্ষেত্র সবচেয়ে সহজ দাওয়াতের ক্ষেত্র।

সারসংক্ষেপ:

সাহাবীদের দাওয়াতী আদর্শ আধুনিক প্রেক্ষাপটে হলো, ব্যক্তিগত আমল ও নৈতিকতার সৌন্দর্য দিয়ে মানুষের আস্থা অর্জন করা এবং যুগের সেরা মাধ্যম ও জ্ঞান ব্যবহার করে নম্রতা ও ভালোবাসার সাথে ইসলামের মৌলিক বার্তাটি পৌঁছানো।

ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার

৬.১. দাওয়াতের সুফল ও ব্যর্থতার কারণ :

সাহাবায়ে কেরামের (রা.) দাওয়াতী জীবনের পর্যালোচনা থেকে আমরা দাওয়াতের সুফল এবং কিছু ক্ষেত্রে দাওয়াত সফল না হওয়ার কারণগুলো পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি। দাওয়াতের প্রক্রিয়াকে সফল করতে হলে এই কারণগুলো অনুধাবন করা অপরিহার্য।

ক. দাওয়াতের সুফল (Success Factors)
সাহাবীদের দাওয়াত অভূতপূর্ব সফলতা লাভ করেছিল, যার মূল কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. ইখলাস ও সততা: দাওয়াতকারীদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি। কোনো দুনিয়াবী প্রতিদান বা খ্যাতি অর্জনের চিন্তা তাঁদের ছিল না। এই আন্তরিকতা মানুষের হৃদয়ে প্রভাব ফেলেছিল।

২. আমলী দাওয়াত: তাঁদের উত্তম চরিত্র, সততা, ও আমানতদারী ছিল দাওয়াতের জীবন্ত সাক্ষী। তাঁরা যা বলতেন, তার আগে নিজেরা তা পালন করতেন।

৩. হিকমত ও বিনয়: তাঁরা পরিস্থিতি ও ব্যক্তির মানসিকতা বুঝে প্রজ্ঞা (হিকমত) ও নম্রতার সাথে দাওয়াত পেশ করতেন। কঠোরতা বা বিতর্কের মাধ্যমে তাঁরা কাজ শুরু করতেন না।

৪. কুরবানি ও ধৈর্য: চরম নির্যাতন ও কষ্টের মুখেও তাঁরা ধৈর্যচ্যুত হননি এবং দ্বীনের জন্য স্বর্গীয় কুরবানি স্বীকার করেছেন (যেমন: হিজরত)। এই অটলতা সত্যের প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে মজবুত করেছিল।

খ. দাওয়াত সফল না হওয়ার কারণ (Potential Failure Points):
অনেক সময় দাওয়াত সফল হয় না, যদিও সাহাবীরা (রা.) এর ব্যতিক্রম ছিলেন। তবুও তাঁদের শিক্ষায় এর ব্যর্থতার কিছু কারণ উঠে আসে, যা আধুনিক দাওয়াতীদের জন্য শিক্ষণীয়:

১. ইলম ও আমলের অনুপস্থিতি: দাওয়াতকারীর যদি দাওয়াত দেওয়ার মতো যথাযথ জ্ঞান (ইলম) না থাকে অথবা তাঁর নিজের আমলের সাথে কথার মিল না থাকে, তবে দাওয়াত ব্যর্থ হতে বাধ্য। (যেমন:আল কুরআন সূরা বাকারা: ২:৪৪ আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে)।

২. অহংকার ও রূঢ়তা: যদি দাওয়াতকারীর আচরণে অহংকার বা রূঢ়তা প্রকাশ পায়, তবে দাওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি সত্যের আলো থেকে দূরে সরে যায়। আল্লাহ রাসূল (সা.)-কে কঠোর না হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কারণ রূঢ়তা মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়।

৩. আকীদাগত বিচ্যুতি: যদি দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু (যেমন: তাওহীদ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বাদ দিয়ে শাখা-প্রশাখা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়, তবে তা দাওয়াতের লক্ষ্য থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে।

৪. অতিরিক্ত দুনিয়াবী আকর্ষণ: দাওয়াতকারী যদি ব্যক্তিগত জীবনে পার্থিব লোভ, ক্ষমতার মোহ বা অর্থ-সম্পদের প্রতি ঝুঁকে পড়েন, তবে তাঁর দাওয়াত তার আধ্যাত্মিক প্রভাব হারায়। দাওয়াতের সফলতা বা ব্যর্থতা মূলত দাওয়াতকারীর ইখলাস, যোগ্যতা ও পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল।

৬.২. আমাদের প্রতি দাওয়াতী দায়িত্ব

সাহাবায়ে কেরামের (রা.) দাওয়াতী জীবন ছিল একটি আদর্শ পথনির্দেশিকা। এই গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা এটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যে, দাওয়াত কেবল কিছু ধর্মীয় ব্যক্তির কাজ নয়, বরং এটি এই উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি এবং প্রতিটি মুসলিমের কাঁধে অর্পিত এক গুরুত্বপূর্ণ আমানত। সাহাবীদের (রা.) কর্মপন্থা আমাদের দেখায় যে, এই দায়িত্ব পালনে আমাদের কী ধরনের প্রস্তুতি ও কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

ক. দাওয়াতের চেতনাকে ধারণ করা:
আমাদের প্রথম দায়িত্ব হলো সাহাবীদের মতো দাওয়াতের মৌলিক চেতনা—ইখলাস, কল্যাণকামিতা, এবং আমলী দাওয়াত—কে নিজেদের জীবনে ফিরিয়ে আনা।

১. চরিত্রের মাধুর্য: আমাদের ব্যক্তিগত আচরণ, সততা, এবং ন্যায়পরায়ণতা যেন ইসলামের নীরব আহ্বানকারী হয়। মানুষ যেন আমাদের চরিত্র দেখেই ইসলামের সৌন্দর্য বুঝতে পারে।

২. ইলম ও প্রজ্ঞা: দাওয়াত দেওয়ার আগে আমাদের সঠিক জ্ঞান (ইলম) অর্জন করতে হবে এবং যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রজ্ঞা (হিকমত) অবলম্বন করতে হবে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বুঝে দাওয়াতকে উপস্থাপন করতে হবে।

খ. উম্মাহর প্রতি আহ্বান:
এই উম্মতের প্রতিটি সদস্যকে সাহাবীদের (রা.) আদর্শ অনুসরণ করে নিজ নিজ গণ্ডিতে দাওয়াতের কাজ করতে হবে।

* পারিবারিক দাওয়াত: প্রথমে নিজের পরিবার, সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়দের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

* সামাজিক দাওয়াত: সমাজের অন্যায়, অবিচার, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নম্রতা ও প্রজ্ঞার সাথে কথা বলতে হবে এবং সামাজিক প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসতে হবে।

* নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টা: দাওয়াতের কাজকে একটি বিচ্ছিন্ন ইভেন্ট হিসেবে না দেখে, জীবনের দৈনন্দিন রুটিন ও নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

গ. চূড়ান্ত ফয়সালা:
দাওয়াতী কাজের ফল বা সফলতা আমাদের হাতে নেই, বরং তা আল্লাহর হাতে। আমাদের দায়িত্ব শুধু আন্তরিকতার সাথে পৌঁছে দেওয়া। সাহাবীরা (রা.) তাঁদের দায়িত্ব পালন করে গেছেন। এখন এই মহান আমানত আমাদের কাছে। তাঁদের ত্যাগ, ভালোবাসা ও প্রজ্ঞাকে আদর্শ মেনে চললে, আশা করা যায় আল্লাহ আমাদের দাওয়াতী কাজকে সফল করবেন এবং আমরা দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হব।
আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর পথে আহ্বানকারী হওয়ার তাওফীক দিন। (আমীন)

সপ্তম অধ্যায়: তথ্যসূত্র

*আল কুরআন :

সূরা বাকারা ২:৪৪

সূরা ইউসুফ: ১২:১০৮

সূরা ত্ব-হা: ২০:৪৩-৪৪

সূরা আল-ইমরান: ৩:১১০

সূরা আত-তাওবাহ: ৯:১২৮

সূরা আহকাফ: ৪৬:৩৫

সূরা নাহল: ১৬:১২৫

*হাদিসগ্রন্হ:-

সহীহ বুখারী, যাকাত অধ্যায়।

বুখারী- মুসলিম।

সহীহ বুখারী, যাকাত অধ্যায়। আত-তাবাকাত আল-কুবরা।

* সীরাত গ্রন্থ:

আর-রাহীকুল মাখতূম।

ইবনে ইসহাকের সীরাত বই থেকে।